প্রকাশকের কথা

জীবন একটি রঙিন ক্যানভাসের নাম। এই ক্যানভাসে রঙতুলির আঁচড়ে তৈরি হয় জীবনের বহুমাত্রিক গল্প। যার ভেতরে থাকে হাসি-কান্না ও দুঃখ-বেদনার সমারোহ। জীবনের গভীর থেকে উঠে আসা গল্পগুলো হয়ে ওঠে ভাবনার উপজীব্য। জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে এই গল্পগুলোর সরস উপাদান, থাকে-বর্ণিল জীবনকথা।

কিছু গল্প হয় দুঃখের উপাখ্যান, সুখের সারকথা। কিছু গল্পজুড়ে থাকে গভীর ভাবনা-চিন্তা ও কাজের প্রতিফলন। জীবনের এই মুহূর্তগুলো যখন শব্দে রূপ নেয়, তখন জীবন হয়ে ওঠে গল্প আর গল্প হয়ে ওঠে জীবন।

আমরা এক দূষিত সমাজে বাস করি। এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে নানা অনিয়ম, অনাচার আর অমানবিকতা। চারদিকে জরা-জীর্ণতার ছড়াছড়ি। সমাজ ও সমাজপতিদের চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম-নীতির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে ভীষণ আর্তনাদে চিৎকার করে উঠি।

এরই ভেতর থেকে মাঝে মাঝে এমন কিছু চরিত্র উঠে আসে যারা স্রোতের বিপরীতে চলতে ভালোবাসে। কথা বলে ওঠে শত অনিয়ম, শত নিষেধাজ্ঞার মাঝে। এরাই যেন ঘোর অমানিশার মাঝে আলোর বিচ্ছুরণ, আশাহীন হৃদয়ের নির্ভরতা। চৈত্রের দহনে এক পশলা বৃষ্টি।

সময়ের প্রয়োজনে জেগে ওঠা এই মানুষগুলোর সম্মিলিত প্রয়াসে নিভু নিভু আলো ধীরে ধীরে রূপ নেয় প্রদীপ্ত অগ্নিশিখায়। বিদূরিত হতে থাকে অশুভ আঁধার। আমাদেরই চারপাশে বইতে থাকে পরিবর্তনের বাসন্তী-বাতাস। সেই বাতাসের ছুটে চলায় ভেঙে পড়ে সব জড়তা আর সংকীর্ণতার দেওয়াল।

সূচিপত্র

বোধ — আরিফ আজাদ ১১

চেরিফুল — আফীফা আবেদীন সাওদা ১৮

দ্বিতীয় বিয়ে — আনিকা তুবা ২৪

অশ্রুভেজা ডায়েরি — আফীফা আবেদীন সাওদা ৩০

সত্যিকারের মনস্টার — আলী আব্দুল্লাহ ৩৭

মায়ের দুআ — নুসরাত জাহান ৪৮

আঁধার মাঝে আলোর পরশ! — সিহিন্তা শরীফা ৫১

আমার যা আছে সবই তো আপনের লইগ্যা — শিহাব আহমেদ তুহিন ৬৩

আমি আবারও যাব — আরিফুল ইসলাম ৬৯

একটি তাওয়াক্কুলের গল্প — মাহমুদুর রহমান ৭৪

নতুন মেয়ে যাইনাব — আফীফা আবেদীন সাওদা ৮০

অনুশোচনা — আরমান ইবনে সোলাইমান ৮৯

জীবনসায়াহ্নে — আরিফ আজাদ ৯২

স্বপ্নেরা বেড়ে ওঠে — শারিন সফি অদ্রিতা ৯৬

এক চিলতে রোদ — সারওয়াত জাবীন আনিকা ১০২

রূপকথাও হেরেছিল — শিহাব আহমেদ তুহিন ১১১

এক টুকরো আলো — আফীফা আবেদীন সাওদা ১১১
বুকাইয়া — মুরসালিন নিলয় ১১৪
মায়ের বিয়ে — যাইনাব আল-গাযী ১৩১
জাওয়াদ ও তার বাবা — নুসরাত জাহান ১৩৯
তোমায় ভালোবাসি — আরিফ আজাদ ১৪১
পূর্ণতার মাঝেই শূন্যতা — আনিকা তুবা ১৪৮
স্পেশাল অফার — জাকারিয়া মাসুদ ১৫১
এক চিলতে হাসি — সানজিদা সিদ্দীকা কথা ১৫৫
উমরাহ — সাদিয়া হোসাইন ১৬১
যা হারিয়ে পেয়েছি — আরিফ আবদাল চৌধুরী ১৬৭
পবিত্র প্রত্যাখ্যান — শেখ আসিফ ১৭৩
জীবনের ব্যাকরণ — আফীফা আবেদীন সাওদা ১৭৫
ভাবনার আধাঁর — আনিকা তুবা ১৮১
মা — নুসরাত জাহান ১৮৫
এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় — আরিফ আজাদ ১৮৭
অন্তর মম বিকশিত করো — আরিফ আবদাল চৌধুরী ১৯৪
অগ্রাধিকার — আফীফা আবেদীন সাওদা ১৯৮
পাঁচশো টাকা — আনিকা তুবা ২০৩
আকাশছোঁয়া আলো — মুরসালিন নিলয় ২০৬

বোধ

আরিফ আজাদ

[এক]

আজ সকাল সকাল বের হতে হবে শাওনকে। দুই জায়গায় দুটি শিডিউল দেওয়া আছে। প্রথমেই যেতে হবে গৌরিপুর হাসপাতালে। সেখানে মামুনের স্ত্রীকে ভর্তি করানো হয়েছে। ডেলিভারি কেইস। গতকাল রাত দেড়টায় মামুন ফোন করে জানিয়েছে, তার স্ত্রীর রক্ত লাগবে। তাও খুব সকাল সকাল। ফোনে মামুন পারলে তো কেঁদেই ফেলে। বারবার বলতে লাগল, 'দোস্ত, আসবি তো? বল না রে! সত্যি সত্যিই কি আগামীকাল আসবি হাসপাতালে? তোর ভাবির খুব ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশান যাচ্ছে। তুই ছাড়া এমন কেউ নাই যে আগামীকাল ভোরে এসে রক্ত দিতে পারবে। প্লিজ দোস্ত, কথা দে আসবি?'

এমনিতে ফোনের রিংটোন বেজে ওঠায় ঘুম ভেঙে গেছে শাওনের। তার ওপর মামুনের এরকম ন্যাকা-কান্না শুনে তার সত্যিই রাগ লাগছিল। ভন ভন করে মাথা ঘুরতে লাগল। ফোনের ওপাশে মামুনের নাক্যামো মার্কা কান্না যেন থামছেই না। একপর্যায়ে শাওন বিরক্ত হয়ে বলল, 'থামবি তুই? এক কথা আর কতবার বলবি? বললাম না আসব। এক কথা কি হাজারবার বলা লাগে?'

শাওনের একপ্রকার ধমক শুনে একটু থামল মামুন। বলল, 'দোস্ত, রাগ করিস না। ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশানে পড়েই তোর কাছে ধরনা দিয়েছি। তাছাড়া আমার হাতে যদি আরও কয়েকটি অপশান থাকত তাহলে তোকে এভাবে জ্বালাতাম না আমি। বিশ্বাস কর।'

শাওন রাগতস্বরে বলল, 'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নেই। তোকে বলেছি তো—আগামীকাল ভোরেই আমি হাসপাতালে থাকব–অন দ্য টাইম। এরপরও তুই বারবার বলে যাচ্ছিস—আসবি তো-আসবি তো? বিরক্তি লাগে না বল?'

মামুন চুপ মেরে গেল যেন। দুই প্রান্তেই নীরবতা। নীরবতা ভেঙে শাওন বলল, 'টেনশন করার কিছু নেই। আমি আগামীকাল খুব ভোরে উপস্থিত থাকব। বুঝেছিস?'

মামুন খুব ধীর-গলায় বলল, 'ধন্যবাদ দোস্ত।'

শাওন অতটা সময়ের অপেক্ষা করেনি। ফোনের লাইন কেটে দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

অন্য শিডিউলটি ক্যাম্পাসের। আজ ডিপার্টমেন্টাল প্রোগ্রাম আছে। প্রোগ্রামের সব দায়-দায়িত্ব চেপেছে শাওনের কাঁধেই। মোটামুটি রকমের একটি ঝামেলায় পড়ে গেল সে। দুটি-ই ইমার্জেন্সি এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ। বের হওয়ার পথে শাওনের মা ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত তাড়াতাড়ি তো কখনই যাস না। আজ যাচ্ছিস যে?'

শাওন ঘাড় বাঁকিয়ে উত্তর দিল, 'কখনই যাই না বলে যে আজ যেতে পারব না—এমন কোনো ব্যাপার আছে নাকি?'

ছেলের উত্তর শুনে শাওনের মা একদম চুপ মেরে গেলেন। তিনি খুব ভালো করেই জানেন তার ছেলে কোনোদিন সোজা কথার সোজা উত্তর দেয় না। তাকে যখন মাছের কাঁটা বেছে মাছ খেতে দেওয়া হতো সে প্লেট ঠেলে দিয়ে বলত, 'কাঁটার জন্য মাছ খাবো না, তা তো বলিনি। মাছ খাবো না বলেছি—কারণ, মাছ খেতে আমার ভালোলাগছে না, তাই। শুধু শুধু বাড়তি যত্ন-আত্তির আমাকে করতে এসো না প্লিজ। বিরক্তি লাগে।'

ছেলের এমন অদ্ভুত আচরণে খুব আহত হন রাহেলা বেগম। বাপ-মরা একমাত্র ছেলে তার। কত স্বপ্ন তাকে ঘিরে! কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ছেলেটির এমন অদ্ভুত স্বভাবের কারণে রাহেলা বেগমের চোখের জল ফেলতে হয়। স্বামী আযহার উদ্দীনের স্বপ্ন ছিল ছেলেকে আলেম বানাবেন। শাওনের যখন সাড়ে তিন বছর

বয়স তখন থেকেই তাকে নিয়ে রোজ মসজিদে চলে যেতেন আযহার উদ্দীন। ছেলেকে পাশে দাঁড় করিয়ে সালাত আদায় করতেন তিনি। এত ছোট্ট বাচ্চাকে মসজিদে আনতেন বলে অন্য মুরব্বী-মুসল্লীরা প্রায়ই দু-চারটি কথা শোনাতেন আযহার সাহেবকে; কিন্তু তাতে একেবারেই পাত্তা দিতেন না তিনি। তার একটাই কথা ছিল—ছোট বাচ্চারা ছোটবেলায় যা শেখে সেটি তারা সবসময় মনে রাখতে পারে। মসজিদে আসা শিখলে বড় হয়েও মসজিদে আসবে।

আযহার উদ্দীনের এই চিন্তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বাবার হাত ধরে খুব ছোট বেলাতেই মসজিদে আসা-যাওয়া করা ছেলেটি বড় হয়ে একেবারে মসজিদমুখী হয় না বললেই চলে। বাবার শেখানো সব বিদ্যে সে ভুলে বসে আছে। অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়ে একেবারে বখে গেছে সে। অথবা হতে পারে অবাধ স্বাধীনতাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাহেলা বেগম প্রায়ই বিড়বিড় করে বলেন, 'অতিরিক্ত স্বাধীনতাও একরকম পরাধীনতা।'

পায়ে মোজা পরতে পরতে শাওন বলল, 'দুপুরে খাব না। ফোন কোরো না।'

রাহেলা বেগম জানতে চাইলেন 'খাবি না কেন? কোথায় খাবি তাহলে?'

মায়ের দিকে অগ্নিদৃষ্টি দিল সে। তার চোখ থেকে যেন আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। খুব কঠিন চেহারায় বলল, 'জাহান্নামে খাব, বুঝতে পেরেছ? কতবার বলেছি আমার ব্যাপারে বেশি নাক গলাতে আসবে না। যখন বলেছি খাব না, তখন খাব না, ব্যস। ফারদার প্রশ্ন করে জানতে চাইবে না—কেন খাব না, কোথায় খাব ইত্যাদি ইত্যাদি...।'

রাহেলা বেগম দ্বিতীয়বারের মতো চুপ মেরে গেলেন। ছেলের এমন স্বভাবের সাথে তিনি আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আগে সে এরকম ব্যবহার করলে তিনি জায়গাতেই চোখের পানি ছেড়ে দিতেন। টপটপ করে তার চোখের জল গড়িয়ে পড়ত মাটিতে। এখন চোখ আর মন—দুটি-ই কেমন যেন শক্ত হয়ে গেছে। অথবা হতে পারে সময়ের সাথে সাথে সয়ে নিয়েছে এগুলো। এখন আর এসব দেখে মনের ভেতরে হাহাকার হয় না। বুক ফেটে কান্না আসে না। মাঝে মাঝে আল্লাহর কাছে নিজের মৃত্যু চাইতে মন চায়। কিন্তু হাদীসে নিজের মৃত্যু চাইতে নিষেধ করা হয়েছে বলে তিনি ধৈর্য ধরে আছেন।

শাওন যখন বের হতে যাবে তখন তিনি আবার বললেন, 'যদি একটু সময় দিতি তাহলে টিফিন ক্যারিয়ারে হালকা কিছু নাস্তা দিয়ে দিতাম। তোর জন্য ভোর থেকেই শীত-পিঠা বানাচ্ছিলাম।'

কিছুই বলল না সে। শুনতে পায়নি—এমন ভাব করে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল। তার চলে যাওয়ার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রাহেলা বেগম। তার মনে পড়ে যায় অতীতের কথা। শাওন যখন তার বাবার সাথে মসজিদে যাওয়ার জন্য অথবা স্কুলে যাওয়ার জন্য বের হতো তখন সে বারবার পেছন ফিরে মায়ের দিকে তাকাত। হাত নেড়ে মুচকি হেসে মাকে বিদায় জানাত। দরজার আড়াল থেকে তিনিও হাত নেড়ে ছোট্ট সোনামণিটাকে বিদায় দিতেন। মা-ছেলের চোখে-চোখে কথা হতো। সেই ছেলে আজ এরকম অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে—তা রাহেলা বেগম স্বপ্নেও ভাবেননি।

[দুই]

শাওন কথা রেখেছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই সে হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে।

গৌরিপুর হাসপাতাল। রোগীদের আসা-যাওয়া এবং চিৎকার-চেঁচামেচিতে গমগম করছে পুরো হাসপাতাল এলাকা। শাওনকে দেখে একরকম দৌড়ে এলো মামুন। চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ। চিন্তা আর অস্থিরতায় শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে সে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে শাওনকে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ দোস্ত। অনেক বড় উপকার করলি আজ'। মামুন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে শাওন বলল, 'তোর বউয়ের কী অবস্থা বল।'

'অবস্থা তো ক্রিটিক্যাল। খুবই ব্লিডিং হয়েছে। এজন্যই ব্লাড লাগছে।'

'ব্লাড কখন নেওয়া হবে?' জানতে চাইল শাওন।

'একটুপরেই।'

'আচ্ছা' বলেই থেমে গেল শাওন। শাওনের যে অন্য আরেক জায়গায় যাওয়ার তাড়া আছে ব্যাপারটি মামুনকে জানানো দরকার মনে করল না সে। বিপদগ্রস্ত মানুষের কাছে বাকি পৃথিবীটাই গৌণ।

ব্লাড দেওয়া শেষে শাওন হাসপাতালের বারান্দায় ফিরে এলো। তাকে দেখে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল মামুন। শাওনের আজকের উপকারের কথা সে কোনোদিন ভুলবে না, এই প্রতিদানের ঋণ কোনোভাবেই শোধ করতে পারবে

না সে—ইত্যাদি বলতে বলতে শিশুর মতোই কাঁদতে লাগল সে। তার কান্না দেখে আশেপাশের লোকজনও ফিরে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। হালকা বিব্রত হচ্ছে শাওন; কিন্তু এই মুহূর্তে মামুনকে থামিয়েও দেওয়া যাচ্ছে না। শাওন বলল, 'আমার একটু তাড়া আছে। আমি তাহলে আসি এবার।'

তার চলে যাওয়ার কথা শুনেই মামুন বলল, 'চলে যাবি মানে? আমার সন্তানের মুখ দেখে যাবি না?'

শাওন খেয়াল করল সন্তানের কথা বলতে গিয়ে অদ্ভুতরকম পাল্টে গেল মামুনের চেহারা। বিষণ্ণতায় নুইয়ে পড়া মুখাবয়বে হঠাৎ আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল। মামুনকে এরকম উৎফুল্ল দেখে শাওন জানতে চাইল 'সন্তানের জন্য খুব অধীর অপেক্ষায় আছিস বলে মনে হচ্ছে?'

হেসে ফেলল মামুন। তাকে দেখে বোঝাই যাবে না যে, সে একটু আগে হাউমাউ করে কেঁদেছে। বলল, 'সন্তান যে কী-জিনিস তা বাবা হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনোদিন বুঝবি না।'

শাওন চুপ করে রইল। ভাবতে লাগল তার বাবার কথা। সে যেদিন পৃথিবীতে আসে সেদিন কি তার বাবাও এরকম অধীর আগ্রহে প্রহর গুনেছে সারাক্ষণ? বাবার স্মৃতি আবছা-আবছা মনে করতে পারে সে। সেই আবছা স্মৃতির সবটুকুজুড়ে আছে বাবার আদর। বাবা তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘুরতেন। বাবার বুকের ওপরে ঘুমিয়ে পড়ার কথাও কিছুটা মনে পড়ে তার। বাবার হাত ধরে স্কুলে যাওয়া, আইসক্রিম খেতে খেতে বাসায় ফেরা—সবকিছু যেন স্মৃতির অতল গহ্বর থেকে হঠাৎ বের হয়ে আসতে চাইছে...

শাওন বলল, 'ভাবিও কি তোর মতোই উদগ্রীব সন্তানের জন্য?'

আবার হেসে উঠে মামুন বলল, 'কী যে বলিস! বাবার চেয়ে একজন মা-ই তার সন্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি উদগ্রীব থাকে। দশ-দশটি মাস পেটের ভেতরে অসহ্য সব যন্ত্রণা সহ্য করে বড় করে তোলে সন্তানকে। ভাবতে পারিস, কতটা ত্যাগ থাকে তাতে? একবার কী হয়েছে জানিস? তোর ভাবি একদিন আমাকে বলল, 'যদি সন্তান জন্মের সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, হয় সন্তান বাঁচবে না-হয় মা; তখন কিন্তু তুমি আমার কথা মোটেই মাথায় আনবে না। আমার সন্তানই যেন আমার ওপরে প্রাধান্য পায়। আমি না থাকলেও সে যেন বেঁচে থাকে এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে। সেদিন তার কথাগুলো শুনে আমার কান্না চলে এসেছিল।'